The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 5-6 No. 9-12 February to August 2012-2013 Page 79-96 Published on February 2015 by the Registrar, Dhaka University ISSN-2075-3098

নোয়াখালির আঞ্চলিক বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের পরিবর্তিত রূপের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ

Abstract:

In general, a dialect differs from its standard form both structurally and phonetically. The dialect of Noakhali is different from both the standard Bangla and any other dialect of Bangladesh. This paper explains the phonological and morphological structures of loan worlds commonly used in Noakhali District.

Key-words: *Dialect of Noakhali; Analogical changes; Phonemics; Morphophonemics; Linguistic analysis.*

ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্ম-প্রচার ও রাজ্যশাসন, ব্যাবসা-বাণিজ্যের লেনদেন প্রভৃতি বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের সুবাদে পৃথিবীর এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় কখনো কখনো স্বরূপে গৃহীত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত রূপে গৃহীত হয়। আর এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় প্রবেশের এ প্রক্রিয়াকে ভাষাবিজ্ঞানে 'কৃতঋণ' বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানের 'কৃতঋণ' শব্দের আরেক নাম বিদেশি শব্দ। কিন্তু নামে 'বিদেশি' হলেও সেসব শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ হিসেবেই বিবেচিত।

বাংলা ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার শ্রেণিভুক্ত। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার সেই নবীন যুগ থেকেই এ ভাষায় বিদেশি শব্দের (শুরুতে আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দ) প্রবেশ ঘটতে থাকে। এছাড়া ব্যাবসা-বাণিজ্যের সূত্রে ওলন্দাজ-পোর্তুগিজ প্রভৃতি ভাষার এবং ভৌগোলিক অবস্থান ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের কারণে ভারত, চীন, জাপান, মিয়ানমার, প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। এরপর ব্রিটিশদের একশ নব্বই বছরের রাজত্বকালে বহু ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রবেশের এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আর যেসব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে তার অধিকাংশই পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

শব্দের পরিবর্তন সাধিত হয় ধ্বনি-পরিবর্তনের কোনো না কোনো সূত্রে। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উপাসনা 'নামায'। কিন্তু প্রাবন্ধিক ইয়াকুব আলী চৌধুরীর একটি প্রবন্ধের নাম 'নমায'। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সেনানি শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, বিষাদ-সিন্ধু খ্যাত মীর মশাররফ হোসেন থেকে শুরু করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পর্যন্ত বহু মনীষী হর-হামেশায় লিখেছেন- এসলাম, এমাম, মোসলেম, মোহাম্মদ–এ রকমের বহু শব্দ, যেগুলোর প্রকৃত রূপ যথাক্রমে ইস্‌লাম, ইমাম, মুসলিম, মুহাম্মাদ (আরবি মাখ্‌রাজ অনুসারে)। মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাস শুরু হয়েছে এভাবে—

> যখন আরব-গগনে এস্‌লাম-রবি মধ্যাকাশে উদিত, সমস্ত আরব-ভূমি এস্‌লাম-গৌরবে গৌরবান্বিত এবং সকলেই সেই প্রভূ হযরত মুহম্মদের (সাঃ) পদানত হইয়াছে; সেই সময় একদা পবিত্র ঈদোৎসবদিনে হযরত প্রধান প্রধান শিষ্যমন্ডলী মধ্যে উপবেশন করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। (বিষাদ-সিন্ধু,২০১২:৯)

লেখক বিষাদ-সিন্ধুর অন্যত্র লিখেছেন- 'এমামভক্ত মোসলেম ঊর্ধ্বশ্বাসে মদিনাভিমুখে চলিলেন।' (বিষাদ-সিন্ধু, ২০১২:৩৭)

নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার তুলনামূলক বেশি। কারণ, এ অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সংখ্যাও বেশি। আবার, বাংলাদেশে বিদেশিদের আগমন ঘটেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমুদ্র পথে বৃহত্তর নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও বরিশাল অঞ্চল দিয়ে। আর নোয়াখালী অঞ্চলে ব্যবহৃত অনেক বিদেশি শব্দকে অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ এখানকার আঞ্চলিক শব্দ মনে করে ভুল করে থাকেন।

যেসব বিদেশি শব্দ নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় বহুলভাবে ব্যবহৃত ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে সেগুলোর দ্বিরীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, বিদেশি শব্দের গঠনরূপের পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার উচ্চারণ প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চারিত হওয়া। নিচে বিস্তৃত আকারে ভাষাতাত্ত্বিক রীতিতে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় গৃহীত কিছু সংখ্যক বিদেশি শব্দের উল্লেখ করা হলো।

আরবি-ফারসি শব্দ

বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে আরব-ইরান প্রভৃতি দেশের মানুষ ইসলাম প্রচার উপলক্ষে ব্যাপক হারে এদেশে আসতে থাকেন। তাই এসব ভাষার যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে তাদের বেশির ভাগই ধর্ম-সংক্রান্ত। লোক-পরম্পরায় এসব শব্দ পরিবর্তিত হয়েছে।

কলমা=কালিমা>কালমা>কলমা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ মহব্বতনগর গ্রামের সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে নাজেহাল করার জন্য বলেছিলো, "কলমা জানো মিয়া।" (লালসালু,১৯৮৬:১১) 'কলমা' হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের মূল আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং মুহাম্মদকে (স.) তাঁর নবী হিসেবে মেনে নেওয়ার শপথ-বাক্য, যার প্রকৃত রূপ 'কালিমা'। 'কালিমা' শব্দের 'ই' ধ্বনি লোপ পেয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'কালমা'। নোয়াখালী অঞ্চলের বাইরের বহু মানুষ বিপদে-আপদে কিংবা কোনো নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুকালে সমস্বরে 'কালমা' পড়ে। নোয়াখালীতে এসে 'কালমা'র 'ক'-এর 'আ' ধ্বনি লোপ পেয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে 'কলমা'। আর স্বরধ্বনি লোপ পাওয়ার এ বিধানকে ব্যাকরণে সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ বলা হয়। যেমন: অলাবু>লাউ, জানালা>জানলা, আশা>আশ ইত্যাদি।

নয/নঅয=নামায>নমায>নয/নঅয

ইমলাম ধর্ম সম্পর্কিত শব্দের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানরা আরবির চেয়ে ফারসি শব্দই বেশি ব্যবহার করে থাকেন। কারণ, আরবদের আগে এদেশে পারস্য বা ইরানের লোকেরা আসেন। তাই সালাত এর পরিবর্তে 'নামায' ব্যবহৃত হয়। ফারসি 'নামায' শব্দের 'ন'-এর 'আ' কার ধ্বনি লোপ পেয়ে 'নমায' হয়েছে। অনেক ধর্মীয় শিক্ষিত লোকও 'নমায' বলে থাকেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াকুব আলী চৌধুরীর একটি প্রবন্ধের নাম 'নমায'। আর 'নামায' 'নমায' হওয়ার ক্ষেত্রে যে স্বরলোপ ঘটেছে তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পূর্বের উদাহরণে দেখানো হয়েছে। আবার, 'নমায' শব্দের 'ম' ধ্বনি লোপ পেয়ে হয়েছে 'নয'। অনেকে আবার, 'ন' এর সাথে 'অ' যোগ করে 'নঅয' উচ্চারণ করে থাকেন। এই 'অ' অবশ্য 'ম' এর উদ্বৃত্তস্বর 'অ', অর্থাৎ, 'ম' এর সাথে যুক্ত 'অ'। আর, 'নমায' শব্দের 'ম' ধ্বনি লোপ পাওয়ার এ বিধানকে ব্যাকরণে অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়। যেমন- 'ফাল্গুন' শব্দের 'ল' লোপ পেয়ে হয়েছে ফাগুন, 'বাতুল' শব্দের 'ত' লোপ পেয়ে হয়েছে 'বাউল'।

অজ্ = হাজ্ব >হজ্ব >অজ্

আমরা অহরহ বলে থাকি "অমুক হজ্ব করতে গেছেন"; "অমুক হজ্বে গিয়ে মারা গেছেন;" কিংবা "অমুক হজ্ব করে এসেছেন।" কিন্তু শব্দটির সঠিক রূপ 'হাজ্ব'। সেখান থেকে 'হ'-এর 'আ' ধ্বনি লোপ পেয়ে হয়েছে হজ্ব/হজ্। অর্থাৎ, শব্দটিতে সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ ঘটেছে। আর নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় এসে 'হজ্ব' শব্দের 'হ' লোপ পেলেও এর সাথে যুক্ত 'অ' ধ্বনি বজায় থেকে নতুন শব্দ হয়েছে 'অজ্'। শব্দের মধ্য থেকে কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলে তার সাথে যে স্বরধ্বনি বা স্বরচিহ্ন থাকে তাকে

ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয় 'উদ্বৃত্তস্বর'। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে, উদ্বৃত্তস্বর কখনো বিলুপ্ত হয়, কখনো বজায় থাকে, কখনো পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে সন্ধি স্থাপন করে; আবার কখনো পূর্বস্বরের বৃদ্ধি ঘটায় (শহীদুল্লাহ্, ২০০২:৭৭-৭৯)। আলোচ্যাংশে 'হজ্' শব্দের 'হ' এর উদ্বৃত্তস্বর 'অ' বজায় রয়েছে।

যগাত=যাকাত>যগাত

আরবি 'যাকাত' শব্দের 'য'-এর 'আ' ধ্বনি লোপ পেয়েছে, যা পূর্বোক্ত স্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষের নিয়মে সাধিত হয়েছে। আর 'ক' ধ্বনিটি 'গ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে 'যগাত' শব্দে পরিণত হয়েছে। আর 'ক' 'গ' তে পরিণত হবার সূত্রটি হচ্ছে- "অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ঘোষ-ধ্বনিতে পরিণত হয়।" অর্থাৎ, বর্গের প্রথম ধ্বনিটি বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয় যেমন: দিক্+অন্ত=দিগন্ত, ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত,ষট্+যন্ত্র=ষড়যন্ত্র,সৎ+ইচ্ছা=সদিচ্ছা ইত্যাদি। আবার, সংস্কৃত শব্দ 'মাতা' ইংরেজিতে 'মাদার' এ পরিণত হয়েছে; ইংরেজদের 'পাপা' বাংলায় হয়েছে 'বাবা'। অর্থাৎ, বর্গের প্রথম ধ্বনি 'ক' 'গ' তে; 'চ' 'জ' তে; 'ট' 'ড'/'ড়' তে; 'প' 'ব' তে পরিণত হয়।

মোলুশ্শরিফ=মিলাদ-শরিফ>মৌলুদ শরিফ>মোলুশ্শরিফ

প্রথম দিক্কার বাঙালি মুসলমান মুন্সি-মৌলভিরা মিলাদ-শরিফকে 'মৌলুদ-শরিফ' বলতেন। এমন কি কাজী নজরুল ইসলামও 'মৌলুদ শরিফ' রূপে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে 'মিলাদ' শব্দের 'ম'-এর 'ই' ধ্বনি 'ঔ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। অভিশ্রুতির (umlaut) মাধ্যমে স্বরচিহ্নের এমন রূপান্তরের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন: করিয়া>করে, খাইয়া>খেয়ে, শুনিয়া>শুনে, মাছুয়া>মেছো, মাইয়া>মেয়ে ইত্যাদি। আর মুন্সি-মৌলভিদের 'মৌলুদ-শরিফ' নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় হয়েছে 'মোলুশ্শরিফ'। এখানে 'ল'-এর 'ঔ' ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত 'ঔ' ধ্বনি 'ও' এবং 'উ'-এ দুই স্বরের সহযোগে গঠিত, যা যৌগিক-স্বর নামে পরিচিত। আর এ রকমের যৌগিক-স্বর উচ্চারণে অনেকেই উদাসীন। তাইতো অহরহ 'মৌলিক'কে 'মোলিক', 'যৌগিক'কে 'যোগিক', 'নৌক'কে 'নোকা', 'ঔপন্যাসিককে 'উপন্যাসিক' 'রাজনৈতিক'কে 'রাজনীতিক', 'মৌলভিকে' 'মোলভি' উচ্চারণ করা হয়। অন্যদিকে 'মৌলুদ-শরিফ' শব্দের 'দ' ধ্বনিটি পরবর্তী ধ্বনি 'শ' এর সাথে সমতা প্রাপ্ত হয়ে নিজেই 'শ' তে পরিণত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করেছে 'মোলুশ্শরিফ'। আর দুটো পাশাপাশি ধ্বনির সমতা প্রাপ্ত হবার এ বিধানকে ব্যাকরণে সমীভবন বা assimilation বলা হয়, যেমন: রাঁধ্না>রান্না, কাঁদনা>কান্না, উন্মাদ>উম্মাদ ইত্যাদি। অবশ্য নোয়াখালী অঞ্চলের কেউ কেউ কেবল সমীভবনের সূত্রে 'মিলাদ-শরিফ'কে 'মিলাশ-শরিফ' বলে থাকেন।

মসিদ্ = মাস্‌জিদ>মস্‌জিদ (মোশ্‌জিদ)>মসিদ

আরবি শব্দ 'মাস্‌জিদ'কে বাংলায় 'মসজিদ' (উচ্চারণ:মোশ্‌জিদ) বলা হয়ে থাকে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ২০১১:৯৬১)। এখানে 'মাস্‌জিদ' শব্দের 'ম'-এর 'আ' ধ্বনি সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ (আদিস্বর লোপ) এর সূত্রে লুপ্ত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'মস্‌জিদ'। আর 'মস্‌জিদ' শব্দের 'জ' ধ্বনিটি ধ্বনিলোপের সূত্রে বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'ই' ধ্বনি অপিনিহিতির সূত্রে 'স' এর সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করেছে 'মসিদ্'। পরের 'ই' ধ্বনি বা 'উ' ধ্বনির আগে উচ্চারিত হবার রীতিকে অপিনিহিতি (apenthesis) বলা হয়, যেমন: আজি>আইজ, সাধু>সাউধ ইত্যাদি। আরবি 'মাস্‌জিদ' শব্দের س (দন্ত্য 'স') বাংলায় ش -এর (তালব্য শ) উচ্চারণ ধারণ করলেও নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় আরবি س এর উচ্চারণই বহাল রয়েছে।

মান্‌রাসা= মাদ্‌রাসাহ্>মাদ্‌রাসা>মান্‌রাসা

আরবি 'মাদ্‌রাসাহ্' শব্দের 'হ' ধ্বনি লোপ পেয়ে বাংলায় তা 'মাদ্‌রাসা' শব্দ হিসেবে গৃহীত (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,২০১১:৯৭৫)। বাংলায় 'হ' কার লোপের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন: আল্লাহ্>আল্লা, বাদশাহ্>বাদশা, শাহ্>শা ইত্যাদি। আর 'মাদ্‌রাসা' শব্দের 'দ' (আরবি- ن) নাসিক্য ধ্বনি 'ম' এর প্রভাবে 'ন' (আরবি- ن) তে পরিণত হয়েছে। এ প্রভাবটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের পাশাপাশি দুটো ধ্বনির একটির প্রভাবে অন্যটি পরিবর্তিত হবার বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়, যেমন: উৎ+মাদ= উন্মাদ, উৎ+লেখ=উল্লেখ, যাবৎ+জীবন= যাবজ্জীবন, কুৎ+ঝাটকা= কুজ্‌ঝটিকা ইত্যাদি। আলোচ্যাংশে 'মাদ্‌রাসা' শব্দের নাসিক্য ধ্বনি 'ম'-এর প্রভাবে তার পার্শ্ববর্তী 'দ' ধ্বনিটিও নাসিক্য ধ্বনি (nasal sound) 'ন' তে পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, 'দ' ধ্বনিটি 'ম' বা অন্য কোনো নাসিক্য ধ্বনিতে পরিণত না হয়ে 'ন' তে পরিণত হলো কেনো ? এর সহজ উত্তর হচ্ছে যে, 'দ' তার উচ্চারণ-স্থানের রীতি মেনেই 'ন' তে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, 'দ' যে বর্গের বর্ণ সে বর্গের নাসিক্য ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়: উৎ+মাদ=উন্মাদ, তৎ+মধ্যে= তন্মধ্যে, দিক্+নির্ণয় = দিঙ্‌নির্ণয় ইত্যাদি।

তারিক= তারিখ>তারিক

ফারসি 'তারিখ' শব্দটি 'তারিক' রূপে উচ্চারণ করা হয়। একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাস করে "আজ কত তারিক ?" অনেক শিক্ষিত লোকও 'দুধ'কে 'দুদ্' 'কাঠ'কে 'কাট' 'বাঘ'কে 'বাগ' উচ্চারণ করে থাকেন। ভাষাবিজ্ঞানে একে মহাপ্রাণহীনতা (nonaspiration) বলা হয়। এ প্রসঙ্গে মোরশেদ লিখেছেন-

অনেক সময় রূপমূলস্থিত মহাপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণতা হারিয়ে অল্পপ্রাণতা লাভ করে। এর পেছনে একটা ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ বিদ্যমান। মহাপ্রাণ ধ্বনি গঠনের সময় ফুসফুস থেকে বাতাস বের হওয়ার পর বাতাসের প্রবাহ হয় আকস্মিক, কিন্তু যদি বহির্গামী বাতাস শ্বাসনালী দিয়ে ধীরে প্রবাহিত হয়, তাহলে ধ্বনিগুলো মহাপ্রাণতা হারিয়ে ফেলে। (মোরশেদ,১৯৯৭:২৪৫-২৪৬)

দস্তকত= দস্তখত>দস্তকত

ফারসি 'দস্তখত' শব্দটির 'খ' ধ্বনিটি নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'ক' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে 'দস্তকত' শব্দে পরিণত হয়েছে। এখানে পূর্ববর্তী নিয়মে বর্ণের nonaspiration বা মহাপ্রাণহীনতা ঘটেছে।

দোয়ান=দোকান>দোয়ান

শব্দের মধ্যে থেকে কোনো ধ্বনি লোপ পাওয়াকে বলা হয় ধ্বনিলোপ, যেমন:- 'ফাল্গুন' শব্দের 'ল' ধ্বনিটি লোপ পাওয়ার ফলে নতুন শব্দ হয়েছে 'ফাগুন'। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের একটি চরণ হচ্ছে "ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে (গীতবিতান,২০১০:১৪৩)। আবার আমাদের দেশের অন্যতম লোকসংগীত 'বাউল গান'। আর 'বাউল' শব্দটি এসেছে 'বাতুল' শব্দ থেকে। 'বাতুল' শব্দের 'ত' লোপ পাওয়ার ফলে নতুন শব্দ হয়েছে 'বাউল'। তেমনি 'দোকান' শব্দের 'ক' ধ্বনিটি লোপ পাওয়ার নতুন শব্দ হয়েছে 'দোয়ান'।

কে'মত/ক্যামত=কিয়ামাত>কিয়ামত/কেয়ামত>কে'মত/ক্যা'মত

আরবি 'কিয়ামাত' শব্দটি বাংলায় 'কিয়ামত' ও 'কেয়ামত' দুই রূপেই গৃহীত (ব্যবহরিক বাংলা অভিধান,২০১১:২৮৭)। আর 'কেয়ামত' শব্দের সংবৃত উচ্চারণ 'কে' নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় বিবৃত উচ্চারণ 'ক্যা' তে পরিণত হয়েছে। আবার 'য়' ধ্বনিটি লোপ পেয়েছে, যা মূলত syncope বা মধ্যস্বরলোপের দৃষ্টান্ত। তবে, 'য়' লোপ পেলেও তার 'আ' ধ্বনি স্বল্প পরিসরে উচ্চারিত হয়, ধ্বনিবিজ্ঞানে যা /অ/ হিসেবে পরিচিত যেমন- correct (k□rekt), dove (d□v) ইত্যাদি।

বাশ্‌শা= বাদশাহ্> বাদশা>বাশশা

নোয়াখালীতে অনেকেই তাঁদের স্নেহভাজন বা আশীর্বাদপুষ্টদের দোয়া করেন-"আল্লা তোরে দ্যাশ্-দুইন্নার বাশ্‌শা করুক।" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তোকে দেশ-দুনিয়ার বাদ্‌শা করুক।" ফারসি 'বাদশাহ্' শব্দের 'হ' লোপ পেয়ে বাংলায় হয়েছে 'বাদশা'। আর বাংলার 'বাদশা' নোয়াখালীতে হয়েছে 'বাশ্‌শা'। এখানে 'শ' ধ্বনিটি দুবার উচ্চারিত হয়েছে, যাকে ভাষাতত্ত্বে বলা হয়- gemination বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব, যেমন: সকাল>সক্কাল,

পাকা>পাক্কা, বড়>বড্ড ইত্যাদি। অবশ্য এও বলা যায় যে, পরাগত সমীভবনের (regressive assimilation) নিয়মে 'দ' ধ্বনিটি 'শ' তে পরিণত হয়েছে।

বন্দা = বান্দাহ্> বান্দা > বন্দা

'বন্দা' শব্দটি একক ভাবে শুনলে এর অর্থ অনুধাবন কষ্টকর হবে। কিন্তু যদি কারো মৃত্যুতে কেউ বলে, "আল্লার বন্দা আল্লা লই গেসে।" কিংবা কারো অষ্টম কিংবা দশম সন্তানের জন্মের সংবাদ শুনে যদি কোনো নোয়াখালীবাসী বলে, "আল্লার বন্দা আল্লা দিসে।" তাহলে বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলের মানুষের পক্ষেই এর অর্থ বোঝা কষ্টকর হবার কথা নয়। ফারসি 'বান্দাহ্' শব্দের 'হ' ধ্বনি লোপ পেয়ে বাংলা ভাষায় 'বান্দা' হয়েছে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ২০১১:৮৫৬)। আর 'বান্দা' শব্দের 'ব'-এর 'আ' ধ্বনি লোপ পেয়ে নোয়াখালীর ভাষায় হয়েছে 'বন্দা'। একে ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয় আদি স্বরলোপ। যেমন: অলাবু>লাউ, উদ্ধার>উধার>ধার ইত্যাদি।

জবনা= জামানাহ>জামানা>জমনা>জবনা

আদি স্বরলোপের সূত্রে পূর্ববর্তী শব্দের ন্যায় আরবি 'জামানাহ' শব্দের 'জ'-এর 'আ' ধ্বনি লোপ পেয়ে এবং 'হ' কার লোপ পেয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'জমনা'। আর 'জমনা' শব্দের 'ম' ধ্বনি 'ব' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে নতুন রূপ হয়েছে 'জবনা', যেমন:- জামিন থেকে 'জাবিন' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

দুইন্না = দুনিয়া> দুইন্না

ফারসি শব্দ 'দুনিয়া'-এর 'ই' ধ্বনি অপিনিহিতির (apenthesis) সূত্রে আগে উচ্চারিত হয়ে এবং 'য়' ধ্বনিটি সমীভবনের (assimilation) সূত্রে 'ন' তে পরিণত হওয়ায় 'দুনিয়া' শব্দটি নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'দুইন্না' শব্দে পরিণত হয়েছে। আর 'দুনিয়া' শব্দের 'ন' এর দ্বিত্ব হওয়া তথা, 'ন' এর প্রভাবে 'য়' ধ্বনিটি 'ন' তে পরিণত হবার বিধানটি হচ্ছে মূলত progassive assimilation বা প্রগত সমীভবন।

বদমাইশ = বদমাশ>বদমাইশ

ফারসি 'বদমাশ' শব্দটি বাংলা অভিধানে 'বদমাশ' এবং 'বদমাইশ' এ দুই রূপেই গৃহীত (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,২০১১:৮২৫)। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'বদমাইশ' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে 'বদমাশ' শব্দে মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির (anaptysix) নিয়মে অতিরিক্ত একটি 'ই' যুক্ত হয়ে তা বদ্‌মাইশ শব্দে পরিণত হয়েছে। মধ্য স্বরাগমের অনুরূপ দৃষ্টান্ত: প্রীতি>পিরীতি, ক্লিপ>কিলিপ, ফিল্ম>ফিলিম ইত্যাদি।

রসুল = রাসুল>রসুল

আরবি 'রাসুল' শব্দের 'র'-এর 'আ' ধ্বনি লোপ পেয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'রসুল'। আর 'আ' ধ্বনি লোপ পাওয়ার এ প্রক্রিয়াকে ভাষাবিজ্ঞানে আদি স্বরলোপ বলা হয়। এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্বে দেখানো হয়েছে। অবশ্য 'রাসুল'কে শিক্ষিত জনেরাও 'রসুল' বলে থাকেন; এটি একাধারে অভিধানসিদ্ধ (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,২০১১:১০২৩)।

শ্যালাম =সালাম>সেলাম>শ্যালাম

আরবি 'সালাম' শব্দের 'স'-এর 'আ' ধ্বনি স্বরধ্বনির রূপান্তর বা অভিশ্রুতির মধ্য দিয়ে 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে 'সেলাম' শব্দে পরিণত হয়েছে। শব্দের স্বরধ্বনি বা স্বরচিহ্নের রূপান্তরের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন: ভিতর>ভেতর, গাছুয়া>গেছো, মাছুয়া>মেছো ইত্যাদি। আর উচ্চারণের ক্ষেত্রে শব্দটিতে দন্ত্য 'স' তালব্য 'শ' এর উচ্চারণ ধারণ করেছে এবং 'এ'-র বিবৃত উচ্চারণ 'অ্যা' হয়েছে। আর বাংলায় দন্ত্য 'স' অহরহ তালব্য 'শ' এর উচ্চারণ ধারণ করে, যেমন: সাগর (শাগোর), সাহস (শহোশ্), সাল (শাল্), স্বার্থ (শার্থো) ইত্যাদি।

মেতর/ম্যাতর= মিহ্তর >মেথর>মেতর/ম্যাতর

ফারসি 'মিহ্তর' শব্দের 'ম'-এর 'ই' ধ্বনি অভিশ্রুতির নিয়মে 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে এবং 'হ' কার লোপ পেয়ে, আর 'ত' ধ্বনিটি মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হয়ে 'থ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে বাংলা ভাষায় 'মেথর' শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,২০১১:৮৯৬-৮৯৭)। কিন্তু ফারসি 'মিহ্তর' শব্দের বাংলায় 'মেথর' শব্দে রূপান্তরিত হওয়াতে কোনো বিপত্তি ঘটেনি। এমনকি 'মেথর' শব্দ ব্যবহারেও কারো কোনো আপত্তি নেই। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় আসলে প্রমিত বাংলায় রূপান্তরিত 'মেথর' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। কেবল 'থ' ধ্বনির মহাপ্রণতা বিলুপ্ত হয়েছে এবং ফারসি তা (ت), বাংলায় 'ত' ধ্বনিটি অটুট রয়েছে।

দার্গা= দারোগা>দার্গা

ফারসি 'দারোগাহ্' শব্দের 'হ' ধ্বনি লোপ পেয়ে এবং মধ্য স্বরলোপের (syncope) নিয়মে 'র'-এর 'ও' ধ্বনি লোপ পেয়ে 'দার্গা' শব্দটি গঠিত হয়েছে। আর 'দার্গা' শব্দটি প্রমিত বাংলার পাশপাশি নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জানোলা=জানালাহ্>জানালা>জানলা>জানোলা

ফারসি 'জানালাহ্' শব্দটির 'হ' ধ্বনি লোপ পেয়ে বাংলা ভাষায় জানালা হয়েছে। আবার, 'জানালা' শব্দের 'ন'-এর 'আ' ধ্বনি মধ্যস্বরলোপের (syncope) সূত্রে লুপ্ত হওয়ায়

নতুন শব্দ হয়েছে 'জানলা' । বাংলায় 'জানালা' ও 'জানলা' দুটো শব্দই অভিধান-স্বীকৃত (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,২০১১:৪৬৬) । আর জানালা শব্দের 'ন'-এর আ ধ্বনি অভিশ্রুতির (umlaut) মধ্য দিয়ে 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় হয়েছে 'জানোলা' । অবশ্য, নোয়াখালীতে অনেকেই 'জানোলা' শব্দের পাশাপাশি 'জানালা' ও 'জানলা' শব্দ দুটোও ব্যবহার করে থাকেন ।

সাকর (sakor)= চাকর (cak?r)>সাকর

'স' দন্ত্য ধ্বনি; জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতকে স্পর্শ করে গঠিত । আর ' চ ' তালব্য ধ্বনি; জিহ্বার মধ্যভাগ মুখবিহরের তালুকে স্পর্শ করার ফলে এর সৃষ্টি । বাংলা উচ্চারণে দন্ত্য ধ্বনির তালব্য ধ্বনিতে পরিণত হবার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন: 'সাগর' শব্দের উচ্চারণ 'শাগোর' 'সাহস'-এর উচ্চারণ 'শাহোশ্', 'স্বার্থ' এর উচ্চারণ 'শার্থো' ইত্যাদি । আবার, তালব্য ধ্বনির দন্ত্য ধ্বনির উচ্চারণ ধারণ করার নজিরও রয়েছে, যেমন- 'শ্রবণ' শব্দের উচ্চরণ 'স্রোবন', 'শৃঙ্খল' এর উচ্চারণ 'সৃঙখল', ইত্যাদি । ফারসি 'চাকর' শব্দের তালব্য ধ্বনি 'চ' নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় দন্ত্য ধ্বনি 'স' তে পরিণত হয়ে 'সাকর' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে । আর শব্দটির উচ্চারণ 'শাকোর' নয় 'সাকোর' (sakor) । অবশ্য অনেকে 'সাকর'(sak?r) উচ্চারণ করেন । অর্থাৎ, জিহবার অগ্রভাগ দাঁতকে স্পর্শ করে 'স' উচ্চারিত হবে । আর এ বিধানকে ধ্বনিবিজ্ঞানে বলা হয় 'সকারীভবন' (assibilation) (জ্যোতিভূষণ,১৯৯৬:৮১) ।

ইংরেজি শব্দ

আরবি-ফারসি শব্দের পর বাংলা ভাষায় সংগত কারণেই (ইংরেজদের একশ নব্বই বছরের রাজত্ব) ইংরেজি শব্দের অবস্থান । নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষাতেও এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায় এবং যথারীতি শব্দগুলো পরিবর্তিত রূপেই ব্যবহৃত হয় । তবে এখানে বলা যায় যে, শব্দের এ পরিবর্তিত রূপের ভাষাতাত্ত্বিক রূপ বিরাজমান । কারণ এসব পরিবর্তন ভাষাতাত্ত্বিক রীতিতেই সাধিত । নিচে কিছু দৃষ্টান্ত দেখানো হলো-

Comfarm (কম্ফারম্)= Confirm>Comfarm

ইংরেজি confirm শব্দের 'n' (ন) নোয়াখালীর অনেকের ভাষায় 'm' (ম)-এ পরিণত হয় । উচ্চারণ রীতি অনুসারে 'ক' বর্গের ধ্বনির আগে (কণ্ঠ্য-ধ্বনি) ঙ, 'চ' বর্গীয় ধ্বনির আগে ঞ, 'ট' বর্গীয় ধ্বনির আগে 'ণ', ত বর্গীয় ধ্বনির আগে 'ন' এবং 'প' বর্গীয় ধ্বনির আগে 'ম' বসে, যেমন: অঙ্ক, অঞ্চল, বণ্টন, সম্মান ইত্যাদি । সে অনুসারে confirm শব্দের 'n' 'm'-এ ('ন' 'ম' তে) পরিণত হয়েছে । অর্থাৎ 'ফ' এর আগে 'ন' না বসে 'ম' বসেছে । আবার, ইংরেজিতে confirm শব্দে 'r' এর উচ্চারণ silent

(অনুচ্চারিত) থাকলেও নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'r' (র)-এর সাথে বাংলা উচ্চারণরীতি অনুসারে অতিরিক্ত একটি 'অ' উচ্চারিত হয়ে confirm (কনফার্ম) শব্দটি 'কম্‌ফারম্' শব্দে রূপলাপ করেছে। বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির অনুরূপ দৃষ্টান্তঃ রত্ন>রতন, যত্ন>যতন, প্রীতি> পিরীতি, গ্রাম> গেরাম ইত্যাদি।

Riks=Risk>Riks

শব্দের মধ্যবর্তী দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনকে ধ্বনি বিপর্যয় বলা হয়, যেমনঃ রিক্‌সা>রিস্‌কা, পিশাচ>পিচাশ, লাফ>ফাল ইত্যাদি। ইংরেজি risk শব্দের 'k' এবং 's' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করায় riks শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। অবশ্য নোয়াখালী অঞ্চলের বাইরের মানুষও riks উচ্চারণ করে থাকেন।

হেলফ্/হেলেফ্= Help (হেল্‌প)>হেলফ্/হেলেফ

ইংরেজি help শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণিকরণ করলে এর রূপ দাঁড়ায় 'হেল্‌প'। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় অনেকে ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্র সরাগম বা বিপ্রকর্ষের নিয়মে 'হেল্‌প' শব্দের 'ল' এর সাথে একটি 'অ' ধ্বনি যোগ করেন; অনেকে আবার একই নিয়মে 'ল' এর সাথে 'এ' যোগ করে এবং 'প' (p) ধ্বনিটিকে 'ফ' '(f-এর কাছাকাছি)' ধ্বনিতে পরিণত করে উচ্চারণ করেন হেলফ্ (helof) কিংবা হেলেফ্ (helef)। এ প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানী আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন-

> উচ্চারণ পদ্ধতির পরিবর্তনজনিত কারণে স্পৃষ্টধ্বনি উষ্ম শিসধ্বনি অথবা ঘৃষ্টধ্বনিতে, মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে, অথবা অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। স্পৃষ্টধ্বনির উষ্ম শিসধ্বনিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যখন প্রোটো ইন্দো-ইউরোপীয়/p/প্রোটো জার্মানীয়/f/ধ্বনিতে রূপান্তরিত। যেমনঃ ল্যাটিন Pater = গথিক fadar। (মোরশেদ, ১৯৯৬:১৭)

ইসকুল=স্কুল>ইসকুল; ইশ্‌টিশন =স্টেইশন > ইস্টিশন > ইশ্‌টিশন

ইংরেজি স্কুল (school) শব্দে আদি স্বরাগম (prothesis) এর নিয়মে একটি 'ই' যুক্ত হওয়ায় শব্দটি 'ইস্‌কুল' শব্দে রূপলাভ করেছে। নোয়াখালী অঞ্চলের বাইরেও শব্দটির অনুরূপ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে ইংরেজি 'station' শব্দটিকে শিক্ষিজনেরাও 'ইস্টিশন' উচ্চারণ করে থাকেন। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ 'স্টেইশন' ($stei\int n$)। (OXFORD,1996:1165) আর 'স্টেশন' শব্দের শুরুতে আদি স্বরাগমের নিয়মে (prothesis) একটি 'ই' বসায় তার আদ্য 'এ' লোপ পেয়েছে। এরপর 'স্টেইশন'

শব্দের 'ই' অপিনিহিতির (apenthesis) সূত্রে 'স্ট' এর আগে উচ্চারিত হয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'ইস্টিশন'। আর 'ইস্টিশন' শব্দের 'স্ট', 'শ+ট' এর উচ্চারণ ধারণ করায় শব্দটি ইশ্‌টিশন এ পরিণত হয়েছে। এমন উচ্চারণ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও লক্ষ করা যায়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত: স্কুল>ইশ্‌কুল, স্টার>ইশ্‌টার ইত্যাদি। ভাষাতত্ত্বে একে palatalization বা তালব্যভবন বলা হয়।

কলজ=কলেজ>কলজ

'কলেজ' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ ক'লিজ্ (Kolidz) (OXFORD,1996:220)। বাংলায় এটি 'কলেজ' শব্দ হিসেবে গৃহীত। আর কলেজ শব্দের 'ল'-এর মধ্যস্বরলোপ (syncope) এর সূত্রে লোপ পাওয়াতে নতুন শব্দ হয়েছে 'কলজ'। অবশ্য নোয়াখালী অঞ্চলের অনেক বয়স্ক লোককে 'কলেজ'কে 'কলশ' উচ্চারণ করতে দেখা যায়। আর 'চ' এর তালব্য উচ্চারণ অটুট রেখে অনেক শিক্ষিত লোককেও 'চশমা' কে 'শশ্‌মা' বলতে শোনা যায়। আর ধ্বনির এ রূপান্তরকে জ্যোতিভূষণ চাকী 'ধ্বনিবিকার' নামে অভিহিত করেছেন (জ্যোতিভূষণ, ১৯৯৬:৮০)।

লাইব্বেরি= লাইব্রেরি>লাইব্বেরি

আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে 'র' ধ্বনি লোপ পায় এবং কখনো কখনো পরবর্তী ব্যঞ্জধ্বনি দ্বিত্ব হয়, যেমন: গ্রাম>গাঁ, ব্যাঘ্র>বাঘ, ক্ষিপ্র>ক্ষেপা, করতে>কত্তে, করলাম>কল্‌লাম ইত্যাদি। তেমনি আলোচ্য 'লাইব্রেরি' শব্দের 'র' ফলা লোপ পেয়ে এবং 'ব' ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব হয়ে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় তা 'লাইব্বেরি' শব্দে রূপলাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে -"শব্দের অভ্যন্তরে অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে র-কার থাকিলে, সেই র-কার চলিত বাঙ্গালা উচ্চারণে বহু স্থলে লুপ্ত হয় (সুনীতিকুমার, ১৯৯৬:৯২)।"

স্যার (sær) =চেয়ার>চের/চ্যার>স্যার

অনেক সময় শব্দের দুটো ধ্বনির মাঝে একটি পিচ্ছিল ধ্বনি (gliding sound) স্বল্পতম সময়ের জন্য উচ্চারিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা একে semi vowel বা 'অর্ধস্বরধ্বনি' নামে অভিহিত করেছেন, যেমন: 'মেয়ে' শব্দে একটি অন্তস্থ 'য়' (y), 'হাওয়া' শব্দের একটি অন্তস্থ-ব (w) এবং 'university' শব্দের শুরুতে একটি অতিরিক্তি 'ই' (*j*) নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয়। আর ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী deniel Jones এবং মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী Blogg ও Trager অভিমত দিয়েছেন যে, যে কারণে এ ধ্বনিগুলোকে semi vowel বলা হয় একই কারণে এগুলোকে semi consonant ও বলা যেতে পারে (উদ্ধৃত, আব্দুল হাই, ১৯৯৮:২৩)। এ শ্রেণির ধ্বনিগুলো এতো স্বল্প সময়ের জন্য

উচ্চারিত হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলো তেমন শ্রুতিগ্রাহ্য হয় না, যেমন: বিটিভির শিশুতোষ কার্টুন 'সিসিমপুর' এর টুকটুকি "মেয়ে মেয়ে মেয়ে, আমি মেয়ে"- শিরোনামে একটি গান গায়। অনেক ছোট মেয়ের কণ্ঠে গানটি "মেএ মেএ মেএ, আমি মেএ"- এ উচ্চারণে শোনা যায়। ইংরেজি 'চেয়ার' (chair) শব্দটির 'য়' শ্রুতিগ্রাহ্য না হয়ে অর্থাৎ, লোপ পেয়ে এবং 'চ'-'এ' কার (ে) বিবৃত উচ্চারণ ধারণ করায় তা 'চ্যার'-এ রূপ লাভ করে। আর নোয়াখালীর ভাষায় 'চ' এর তালব্য উচ্চারণ, দন্ত্য উচ্চারণ ধারণ করায় শব্দটি 'স্যার' এ পরিণত হয়েছে। আর এর উচ্চারণ কিন্তু 'সার' কিংবা 'শের' নয়, জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতে লাগিয়ে স্যার (sær)।

মাশ্‌টর = মাস্টার>মাশ্‌টার>মাশ্‌টর

ইংরেজি মাস্টার (master) শব্দের দন্ত্য 'স' তালব্যভবনের সূত্রে (palatalization) তালব্য 'শ' তে পরিণত হয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'মাশ্‌টার'। আর দন্ত্যধ্বনি তালব্য ধ্বনিতে, বিশেষ করে দন্ত্য-'স' তালব্য-'শ' তে পরিণত হবার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন: ক্লাস (class) >ক্লাশ (clash), গ্লাস (glass)> গ্লাশ (glash), গোস্ত> গোশ্‌ত, স্কুল>ইশ্‌কুল, স্টেইশন>ইশ্‌টিশন ইত্যাদি। জনপ্রিয় একটি বাংলা গানের প্রথম কলি 'ইশ্‌টিশনের রেলগাড়িটা, মাইপ্‌পা চলে ঘড়ির কাঁটা।" অন্যদিকে 'মাস্টার' শব্দটি 'মাশ্‌টার' শব্দে পরিণত হবার পর মধ্যস্বরলোপ (syncope) এর সূত্রে 'ট'-এর 'আ' ধ্বনি লোপ পেয়ে তা 'মাশ্‌টর' এ পরিণত হয়েছে। আর 'মাস্টার' শব্দের দন্ত্য 'স' তালব্য 'শ'তে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলামের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন-"সচরাচর দেখা যায় যে, দন্ত্য এবং কণ্ঠ্য ধ্বনিসমূহ পরবর্তী সম্মুখ স্বরধ্বনির সঙ্গে সমীভূত হয়েছে, এই সমীভবনকেই 'তালব্যভবন' বা 'palatalizaition' বলা হয়।"(রফিকুল, ১৯৯৭:২৯৬)

ক্যারাসি=কেরোসিন>কেরাসিন>কেরাসি>ক্যারাসি

ইংরেজি কেরোসিন (kerosene) শব্দটি 'কেরাসিন' শব্দ হিসাবেও বাংলা অভিধানে গৃহীত (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ২০১১:২৮৭)। অর্থাৎ কেরোসিন শব্দের 'র'-এর ও ধ্বনি ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে (অভিশ্রুতি) 'আ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। আর নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'কেরাসিন' শব্দের 'ন' ধ্বনিটি ধ্বনিলোপের সূত্রে লুপ্ত হওয়ায় শব্দটি 'কেরাসি' শব্দে পরিণত হয়েছে। অবশ্য উচ্চারণে 'ক'-এর 'এ' ধ্বনি বিবৃত উচ্চারণ ধারণ করায় শব্দটির উচ্চারণ হয়েছে 'ক্যারাসি', যেমন:-'একা' শব্দের উচ্চারণ 'অ্যাকা' 'তেনা' শব্দের উচ্চারণ 'ত্যানা' 'দেখা' শব্দের উচ্চারণ 'দ্যাখা' 'খেলা' শব্দের উচ্চারণ 'খ্যালা' ইত্যাদি।

টিস=ট্রিক্স (Tricks)>টিস

'ট্রিক্স' শব্দের 'ট'-এর 'র' এবং 'ক্' ধ্বনি লোপ পেয়ে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় তা 'টিস্' শব্দে রূপ লাভ করেছে। 'র' লোপ পাওয়ার বিষয়টি ইতঃপূর্বে লাইব্রেরি থেকে লাইব্বেরি শব্দের রূপান্তর প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামতের আলোকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে 'ট্রিক্স' শব্দের 'ক' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জন-লোপের সূত্রে লোপ পেয়েছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত-ফাল্গুন>ফাগুন, বাতুল>বাউল ইত্যাদি।

ফাউডার=পাউডার>ফাউডার

পাউডার শব্দের 'প' (p) , 'ফ' (f এর কাছাকাছি) ধ্বনিতে পরিণত হয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'ফাউডার'। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। আর অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হবার ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ ইতঃপূর্বে 'help' শব্দের হেলেফ/হেলফ শব্দে পরিণত হওয়ার প্রসঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

কিলিফ্=ক্লিপ>কিলিপ>কিলিফ্; ফিলিম্=ফিল্ম>ফিলিম্

মধ্য সরাগমের (anaptyxis) নিয়মে 'ক্লিপ' শব্দটি 'কিলিপ্' হয়েছে। অর্থাৎ 'ল' ধ্বনির আগে একটি অতিরিক্ত 'ই' যুক্ত হয়েছে। আর 'কিলিপ্' শব্দের 'প' ধ্বনিটি মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হয়ে 'ফ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'কিলিপ' হয়েছে 'কিলিফ্'। অন্যদিকে 'ফিল্ম' শব্দের 'ল' ধ্বনির সাথে একটি 'ই' মধ্যস্বরাগমের নিয়মে যুক্ত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে ফিলিম্। অনেকে আবার একটু শুদ্ধ করার মানসে 'পিলিম' উচ্চারণ করে থাকেন। আর তাদের 'ফ' কে 'প' উচ্চারণ করার কারণ মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হবার সূত্রে বিদ্যমান। সূত্রটি ইতঃপূর্বে 'হেলেফ'/'হেলফ' শব্দের বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যান্য বিদেশি শব্দ

ভূ-রাজনৈতিক কারণ এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগের সূত্রে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় এসে এসব শব্দ যথারীতি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। নিচে এ ধরনের কিছু শব্দের পরিবর্তন-পক্রিয়ার ভাষাতাত্ত্বিক রীতি তুলে ধরা হলো-

টুবি=টুপি>টুবি

অনেকের ধারণা 'টুপি' শব্দটি আরবি কিংবা ফারসি শব্দ। আসলে শব্দটি পর্তুগিজ ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। আর 'টুপি' শব্দের 'প' নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'ব' তে পরিণত হয়ে 'টুবি' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ, "অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়"–ধ্বনিতত্ত্বের এ সূত্রটি এখানে ক্রিয়াশীল।

তোয়াইল্লা=তোয়ালিয়া (পো. তোয়ালহা-toalha)> তোয়াইল্লা

পর্তুগিজ 'তোয়ালহা' (toalha) শব্দটি বাংলা ভাষায় 'তোয়ালিয়া' শব্দ হিসেবে গৃহীত (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,২০১১:৫৭১)। অবশ্য 'তোয়ালিয়া' শব্দটি অভিশ্রুতির (umlaut) মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে চলিত ভাষায় 'তোয়ালে' শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর 'তোয়ালিয়া' শব্দের 'ল'-এর 'ই' ধ্বনি অপিনিহিতির (apenthesis) সূত্রে আগে উচ্চারিত হয়ে এবং 'য়' ধ্বনিটি সমীভবনের (assimilation) সূত্রে 'ল' এর সাথে সমতা প্রাপ্ত হওয়ায় 'তোয়ালিয়া' শব্দটি নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় হয়েছে 'তোয়াইললা'।

লঙ্গি/লঙি=লৌঙ্গি>লুঙ্গি>লঙ্গি/লঙি

বর্মি 'লৌঙ্গি' শব্দটি ধ্বনিপরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় 'লুঙ্গি' শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ২০১১:১০৫৭)। অর্থাৎ, অভিশ্রুতির মাধ্যমে 'ল'-এর 'ঔ' ধ্বনি এখানে 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'ল'-এর 'উ' ধ্বনি আদিস্বরলোপ (aphesis) এর সূত্রে লোপ পাওয়ায় শব্দটি 'লঙ্গি'তে পরিণত হয়েছে। আর আধুনিক চলিত বাংলায় 'ঙ্গ' 'ঙ'তে পরিণত হয় এবং 'গঁ'-এর উচ্চারণ ধারণ করে। তাই নোয়াখালীতে অনেকে 'লঙ্গি'র পাশাপাশি 'লঙি' বলে থাকেন। আর 'লঙ্গি' কিংবা 'লঙি' এদের উচ্চারণ কিন্তু যথাক্রমে 'লোঙ্‌গি' ও লোগিঁ। কারণ, বাংলা একাডেমির উচ্চারণ অভিধানের বিধান অনুসারে 'অ' এর পর 'ই' ধ্বনি থাকলে 'অ' সংবৃত তথা 'ও' এর মতো উচ্চারিত হয়, যেমন: অতিথি (ওতিথি), সমিতি (শোমিতি), প্রতিভা (প্রোতিভা) অধিকার (ওধিকার) ইত্যাদি।

নোয়া=নয়া>নোয়া

সংস্কৃত 'নব' শব্দটি প্রাকৃত ভাষায় 'ণঅ' শব্দে রূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ, 'নব' শব্দের 'ব' ধ্বনিটি প্রাকৃত ভাষায় অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের সূত্রে লুপ্ত হয়েছে। প্রাকৃত 'ণঅ' শব্দটি অন্ত্যস্বরাগমের (apothesis) নিয়মে হিন্দি ভাষায় 'নয়া' শব্দে রূপ লাভ করেছে (সংসদ বাংলা অভিধান:৩৬৬), যেমন: নয়াদিল্লি, নয়া-জামানা, নয়া-জিন্দিগি ইত্যাদি। আর হিন্দি 'নয়া' শব্দের শুরুতে আদি স্বরাগমের (phothesis) নিয়মে 'ও' ধ্বনি যুক্ত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'নোয়া'। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, হিন্দি 'নয়া' শব্দের 'ন' এর সাথে যে একটা অদৃশ্য 'অ' ধ্বনি সংযুক্ত আছে তা অভিশ্রুতির মাধ্যমে 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'নোয়াখালী' নামটাও এভাবে এসেছে, যেমন:- নয়া + খাল + ঈ = নয়াখালী > নোয়াখালী। আমার ময়মনসিংহ অঞ্চলের এক বন্ধুকে প্রায়ই 'নয়াখালী' বলতে শুনতাম।

হাবিয়া/হাইয়া=পেঁপে (পো. Papaya)> হাবিয়া/হাইয়া

পর্তুগিজ 'পাপায়া' শব্দটি বাংলা ভাষায় অভিশ্রুতির মধ্য দিয়ে 'পেঁপে' শব্দ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। আর পর্তুগিজ 'পাপায়া' শব্দের প্রথম 'প' (p) ধ্বনিটি 'হ' (h) ধ্বনিতে পরিণত হয়ে এবং দ্বিতীয় 'প'(p) ধ্বনিটি " অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনিতে পরিণত হয়"-এ সূত্রে 'ব' তে পরিণত হয়ে এবং 'প'-এর 'আ' ধ্বনি অভিশ্রুতির ফলে 'ই' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'হাবিয়া' শব্দে রূপলাভ করেছে। অনেকে আবার একটু আধুনিক ও সংক্ষেপ করার মানসে অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের সূত্রে 'হাবিয়া'র 'ব' তুলে দিয়ে 'হাইয়া' উচ্চারণ করে থাকেন। এঁদের আবার ধারণা যে, অপেক্ষাকৃত অন্তজশ্রেণির মানুষ, তথা চরাঞ্চলের লোক 'হাবিয়া' বলে থাকেন। তবে, 'হাবিয়া' কিংবা 'হাইয়া' শব্দ দুটো ধ্বনিতাত্ত্বিক রীতিতেই সাধিত হয়েছে।

হত্তাল=হরতাল>হত্তাল

বাংলা ভাষায় 'হরতাল' শব্দটি এসেছে গুজরাটি ভাষা থেকে। শব্দটি হর+তাল= হরতাল, এভাবে গঠিত হয়েছে। এখানে 'হর' মানে প্রতি, আর 'তাল' মানে তালা। অর্থাৎ, প্রতি দরজায় তালা। আর 'হরতাল' শব্দের 'র' ধ্বনিটি সমীভবনের (assimilation) সূত্রে 'ত' ধ্বনির প্রভাবে 'ত' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় গুজরাটি 'হরতাল' নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় হয়েছে 'হত্তাল'। সমীভবনের অনুরূপ দৃষ্টান্ত- রাঁধনা>রান্না, কাঁদনা>কান্না ইত্যাদি।

ফাওরুডি=পাওরুটি>পাউরুটি/পাঁউরুটি>ফাওরুডি

পর্তুগিজ 'পাওরুটি' শব্দটি বাংলায় একাধারে 'পাউরুটি' ও পাঁউরুটি এ দুই রূপেই গৃহীত (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান:৭৩৫)। আর নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় তা হয়েছে 'ফাওরুডি'। এক্ষেত্রে পর্তুগিজ 'পাওরুটি' শব্দের 'ও' ধ্বনিটি অটুট থাকলেও 'প' ধ্বনিটি মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হয়ে 'ফ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে 'পাওরুটি' শব্দের 'ট' ধ্বনিটি "অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনিতে পরিণত হয়"- এ সূত্রে 'ড' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

মিশ্রশব্দ

অনেক সময় দুই ভাষার দুটি শব্দ বা শব্দাংশ অথবা এক ভাষার শব্দের সাথে অন্য ভাষার উপসর্গ বা প্রত্যয় মিলে নতুন শব্দ গঠিত হয়। আর এ ধরনের নবগঠিত শব্দকে বলা হয় মিশ্রশব্দ, যেমন: বেটাইম (ফারসি+ইংরেজি), রাজা-বাদশা (সংস্কৃত+ফারসি), হাট-বাজার (বাংলা+ফারসি), খ্রিস্টাব্দ (ইংরেজি+সংস্কৃত)

ইত্যাদি। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষাতেও এমন কিছু মিশ্রশব্দের পরিবর্তিত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। নিচে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ভাষাতাত্ত্বিক কারণ উল্লেখ করে এ ধরনের কিছু শব্দের পরিচয় তুলে ধরা হলো-

মাশ্‌টর-মশাই=মাস্টার-মহাশয়>মাশ্‌টর-মশাই

ইংরেজি মাস্টার আর সংস্কৃত মহাশয় শব্দ দুটো মিলে বাংলায় মিশ্র-শব্দ হয়েছে মাস্টার-মহাশয়। আর নোয়াখালীর ভাষায় তা হয়েছে মাশ্‌টর-মশাই। ইতঃপূর্বে ইংরেজি ভাষা থেকে আগত শব্দের আলোচনায় 'মাস্টার' শব্দটি কী করে 'মাশ্‌টর' শব্দে পরিণত হয়েছে তার ভাষাতাত্ত্বিক কারণ তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মশাই' শব্দের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। সংস্কৃত 'মহাশয়' শব্দটির 'হ' ধ্বনি লোপ পেয়ে, মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে 'শ' এর সাথে একটি 'আ' ধ্বনি যুক্ত হয়ে এবং অর্ধস্বর 'য়' (y) অর্ধস্বর 'ই' (i) তে পরিণত হওয়ায় তা 'মশাই' শব্দে পরিণত হয়েছে। অবশ্য 'মশাই' শব্দটিও অভিধানসিদ্ধ (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান: ৯৬০)।

রাজা-বাশ্‌শা=রাজা-বাদশা>রাজা-বাশ্‌শা

বাংলা শব্দ 'রাজা' আর ফারসি 'বাদশা' শব্দ মিলে নতুন শব্দ হয়েছে রাজা-বাদশা। আর নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'বাদশা' শব্দের 'দ' ধ্বনিটি পরাগত সমীভবনের (regressive assimilaion) সূত্রে 'শ' তে পরিণত হয়েছে। তাই এখানে 'রাজা-বাদশা'কে বলা হয় 'রাজা-বাশ্‌শা'। অবশ্য 'দ' এর 'শ' তে পরিণত হবার বিধানকে long consonant বা ব্যঞ্জন-দ্বিত্বও বলা যেতে পারে, যেমন: বড়>বডড, পাকা>পাক্কা, একা>এককা, সকাল>সক্‌কাল ইত্যাদি।

বেক্কল(ব্যাক্কল)=বেআকল>বেক্কল

আরবি 'আকল' শব্দের অর্থ জ্ঞান, বুদ্ধি। এর আগে ফারসি 'বে' উপসর্গ যুক্ত হওয়ায় মিশ্রশব্দ হয়েছে 'বেআকল'। আর 'বেআকল' শব্দের 'আ' ধ্বনিটি মধ্যস্বরলোপের (syncope) সূত্রে লুপ্ত হয়ে এবং ক ধ্বনিটি দ্বিত্ব-ব্যঞ্জনের (long consonant) সূত্রে দ্বিত্ব হয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'বেক্কল'। আর নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'বেক্কল' শব্দের 'ব'-এ ধ্বনি বিবৃত উচ্চারণ ধারণ করায় এর উচ্চারণ হয়েছে 'ব্যাক্‌কল'।

বেদ্দপ (ব্যাদ্‌দপ)=বেআদব>বেদ্দব>ব্যাদ্‌দপ

আরবি 'আদব' শব্দের আগে পূর্বোক্ত নিয়মে ফারসি 'বে' উপসর্গ যুক্ত হয়ে মিশ্রশব্দ হয়েছে 'বেআদব'। আর 'বেআদব' শব্দের 'আ' লোপ পেয়ে এবং 'দ' দ্বিত্ব হয়ে নতুন রূপ হয়েছে 'বেদ্দব'। আবার অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি 'ব' অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি 'প' তে পরিণত হওয়ায় 'বেদ্দব' হয়েছে 'বেদ্দপ'। অন্যদিকে 'ব'-এর 'এ' ধ্বনি বিবৃত উচ্চারণ ধারণ করায় এর উচ্চারণ হয়েছে যথারীতি 'ব্যাদ্‌দপ্'।

হকেটমাইর=পকেটমার>হকেটমাইর

ইংরেজি 'পকেট' শব্দের সাথে বাংলা 'মার' শব্দ যুক্ত হয়ে মিশ্রশব্দ হয়েছে 'পকেটমার'। আর 'পকেটমার' শব্দের 'প' ধ্বনিটি ব্যঞ্জন-বিকৃতির সূত্রে 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে এবং 'মার' শব্দে মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষের (anaptyxis) নিয়মে একটি 'ই' যুক্ত হয়ে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় হয়েছে 'হকেট-মাইর'। অবশ্য এ অঞ্চলের কোনো কোনো বয়স্ক ব্যক্তি 'হকট মাইর' বলে থাকেন। অর্থাৎ, তাঁদের উচ্চারণে 'ক'-এর ধ্বনি মধ্যস্বরলোপের (syncope) সূত্রে লোপ পেয়েছে।

ডাক্তরখানা=ডাক্তারখানা>ডাক্তরখানা

ইংরেজি 'doctor' শব্দটি বাংলায় 'ডাক্তার' শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আর ইংরেজি 'ডাক্তার' এবং ফারসি 'খানা' মিলে বাংলায় মিশ্রশব্দ হয়েছে ডাক্তার-খানা; নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় হয়েছে 'ডাক্তরখানা'। এক্ষেত্রে ডাক্তার শব্দের 'ক্ত'-এর আ ধ্বনি মধ্যস্বরলোপের (syncope) সূত্রে লোপ পেয়েছে।

সো'দ্দি= চৌ-হদ্দি> সো'দ্দি

ফারসি 'চৌ' আর আরবি 'হদ্দি' মিলে হয়েছে চৌহদ্দি। এর মানে হচ্ছে চারপাশ বা চারদিকের সীমা। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'ঔ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে, তালব্য ধ্বনি 'চ' দন্ত্য ধ্বনি 'স' তে পরিণত হয়ে এবং 'হ' ধ্বনি লোপ পেয়ে 'চৌহদ্দি' হয়েছে সো'দ্দি, যেমন: "এমন বালা মাইয়া আঙ্‌গো সো'দ্দির মইধ্যে নাই।" 'চ' 'স' তে পরিণত হবার বিষয়টি ইতঃপূর্বে 'চাকর' থেকে 'সাকর' শব্দের রূপান্তর প্রসঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আর 'ঔ' ধ্বনির কথ্যরূপে 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হবার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন: পৌষ>পোষ, ঔষধ>ওষুধ, ইংরেজি কৌর্ট -court >বাংলা-কোর্ট ইত্যাদি।

উপসংহার

নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় গৃহীত বিদেশি ভাষার শব্দের সংখ্যা নগণ্য নয়। অনেক সময় বিদেশিদের প্রত্যক্ষ সংস্রবে অথবা প্রমিত বাংলার কৃতঋণ শব্দ এ উপভাষায় সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রবেশ করেছে। বিদেশি শব্দ ঋণ হিসাবে গ্রহণের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চারণজনিত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে ক্ষুদ্র পরিসরে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় যেসব বিদেশি শব্দ বহুলভাবে ব্যবহৃত সেগুলো গ্রহণ করার পর গঠনগত দিক থেকে পরিবর্তন-প্রকৃতি নির্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

ক.অভিধান

বাংলা একাডেমি । জুন-২০১১ । *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী । চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ ।

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান । ১৩৭৮বঙ্গাব্দ । সংকলক: শৈলেন্দ্র বিশ্বাস । কলিকাতা: সাহিত্যসংসদ । চতুর্থ সংস্করণ ।

OXFORD Advanced Learner's DICTIONARY. 1996. Editor: Janathon crowther, OXFORD UNIVERSITY PRESS

খ. ভাষাবিজ্ঞান

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ । ১৯৯৭ । *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* । কলিকাতা: নয়া উদ্যোগ । দ্বিতীয় সংস্করণ ।

জ্যোতিভূষণ চাকী । ১৯৯৬ । *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* । কলিকাতা: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ।

মুহম্মদ আবদুল হাই । ১৯৯৮ । *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* । ঢাকা: মল্লিক ব্রদার্স । ষষ্ঠ মুদ্রণ ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ । ২০০২ । *বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত* । ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স । তৃতীয় মুদ্রণ ।

রফিকুল ইসলাম ।১৯৯৭ । *ভাষাতত্ত* । ঢাকা: বুক ভিউ । পঞ্চম সংস্করণ ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । ১৯৯৬ । *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* । কলিকাতা: রূপা সংস্করণ । পুনর্মুদ্রণ ।

গ. সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থ

মীর মশাররফ হোসেন । ২০১২ । *বিষাদ-সিন্ধু* । ঢাকা: সাহিত্যমালা ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২০১০ । *গীতবিতান* । ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । ১৯৮৬ । *লালসালু* । ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান ।